শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কমিউনিটির কার্যকর অংশগ্রহণ: একটি পর্যালোচনা

গৌতম রায়*

ভূমিকা

মানুষের নানাবিধ বিকাশের লক্ষ্যে সমাজ ও রাষ্ট্র কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হচ্ছে বিদ্যালয়। বিদ্যালয়ে শিক্ষা 'আদানপ্রদানের' ব্যবস্থা থাকে এবং বিভিন্ন ধরনের বিদ্যালয়ের দেখা মেলে একটি সমাজ বা রাষ্ট্রে। এগুলোকে সামগ্রিকভাবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসেবে অভিহিত করা যায় এবং সমাজ-রাষ্ট্রনির্বিশেষে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে অপরাপর প্রতিষ্ঠান থেকে ভিন্নতর দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা হয়। শিশুর জন্মের পর পরিবারই প্রথম তার নানাবিধ বিকাশের লক্ষ্যে কাজ করে। এসবের মধ্যে শারীরিক, মানসিক, সামাজিক, আবেগিক ইত্যাদি বিকাশ অন্তর্ভুক্ত। পাশাপাশি সমাজের অন্যান্য মানুষ ও প্রপঞ্চসমূহও সমান্তরালে শিশুদের বিকাশে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে। একটি নির্দিষ্ট সময় পর পরিবার ও সমাজের পাশাপাশি আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ শিশুর বিকাশের লক্ষ্যে গোছানো কার্যক্রম পরিচালিত করে থাকে।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সমাজবহির্ভূত কোনো প্রতিষ্ঠান নয়, বরং সমাজের মধ্যভাগে থাকা এক ধরনের আনুষ্ঠানিক চর্চাকেন্দ্র। শিশুরা তাদের নিজ নিজ পরিবারে বেশ কিছু আচার-আচরণ শেখে, পাড়া-প্রতিবেশি ও সঙ্গীসাথীদের সাথে মিশে আরও নানা ধরনের সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার বিষয়বস্তুসমূহ আয়ত্ত করে। রাষ্ট্র কর্তৃক নির্ধারিত বয়সে শিশুরা যখন সংশ্লিষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে গমন করে, তখন থেকে তারা প্রক্রিয়াগতভাবে প্রচুর নতুন নতুন জিনিসের মুখোমুখি হতে থাকে। এসব নতুন বিষয়বস্তুর কোনোকিছুই অবশ্য সমাজের বাইরে থেকে আসে না, কিন্তু প্রতিটি শিশুর জন্য এসব নতুন বিষয় হয়ে ধরা দেয়। পার্থক্য এটুকুই হয়, সমাজ যেভাবে শিশুকে বিকশিত করে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের দ্বারা বিকশিত করার ধরন তার চেয়ে ভিন্ন। এ পার্থক্যটুকুর কারণে অনেক সময় সমাজ ও বিদ্যালয়ের মধ্যকার দূরত্ব সৃষ্টি হতে পারে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে সৃষ্টি হয়ও।

সমাজ ও বিদ্যালয়ের দূরত্ব ঘোচানোর ক্ষেত্রে তো বটেই, শিশুর বিকাশের যাবতীয় আয়োজন সমান্তরালে চালানোর জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সাথে সমাজের একটি সরাসরি যোগসূত্র থাকা প্রয়োজন। কেন প্রয়োজন তা পরবর্তী অংশে আলোচিত হবে। তবে বিভিন্ন গবেষণা থেকে দেখা যাচ্ছে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নানাবিধ কার্যক্রমে সমাজের বিভিন্ন স্তরের ব্যক্তি স্ব স্ব অবস্থান থেকে অংশগ্রহণ করেন– কোনো দেশে কম, কোথাওবা বেশি। বর্তমান লেখায় বাংলাদেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে, বিশেষত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে, সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষদের অংশগ্রহণ কতোটুকু কার্যকর হচ্ছে, সে সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

কমিউনিটি কী?

এই লেখার ভূমিকা অংশে যদিও সমাজের কথা বলা হচ্ছে এবং সমাজ শব্দটির আভিধানিক ইংরেজি প্রতিশব্দ হচ্ছে society; কিন্তু society ও community-এর মধ্যে একটি বড় ফারাক রয়েছে। পার্থক্য রয়েছে এ-

* প্রভাষক, শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী। ইমেইল: goutamroy@ru.ac.bd

ধরনের অপরাপর শব্দগুলোর মধ্যেও। এখানে সমাজ শব্দটির বিকল্প হিসেবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে society-এর অংশগ্রহণ নিয়ে আলোচনা করার বদলে community-এর অংশগ্রহণ নিয়ে আলোচনা করা শ্রেয় হবে। কারণ শব্দগত দিক দিয়ে society শব্দটি বড় পরিসরে আলোচনার দাবি করে। অপরদিকে community শব্দটির বেশ কিছু আভিধানিক অর্থ যেমন– সম্প্রদায়, সমাজ, গোষ্ঠী, দল, জনসমাজ ইত্যাদি থাকলেও উক্ত শব্দগুলোর প্রতিটির আলাদা আলাদা অর্থ রয়েছে, রয়েছে আলাদা আলাদা ব্যঞ্জনাও। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে community-এর অংশগ্রহণ বলতে আমরা যা বুঝি, সেগুলো উক্ত শব্দগুলো দ্বারা প্রতিস্থাপন করা কঠিন। এছাড়া কমিউনিটি শব্দটি বাংলায় এখন বহুল ব্যবহৃত, ফলে এই লেখায় বিদ্যালয়-কর্মকাণ্ডে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষদের অংশগ্রহণ বলতে 'কমিউনিটির অংশগ্রহণ' শব্দদ্বয় ব্যবহার করা হবে।

কমিউনিটি বলতে কী বুঝায়? Niranjanaradhya (2014)-এর মতে, "একটি নির্দিষ্ট এলাকায় বসবাসকারী মানুষ যারা সংস্কৃতি, ভাষা, ঐতিহ্য, ভৌগোলিক অবস্থান কিংবা শ্রেণিগতভাবে কাছাকাছি অবস্থান করে, তাদেরকে একটি কমিউনিটি আখ্যায়িত করা যায়" (পৃ. ১)। বাংলাদেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে কমিউনিটির অংশগ্রহণের বৈশিষ্ট্য যাচাই করলে উক্ত সংজ্ঞারই প্রতিফলন দেখা যায়। অবশ্য সংস্কৃতি, ভাষা, ঐতিহ্য বা ভৌগোলিক অবস্থানের বিচারে বাংলাদেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যক্রমে যেসব কমিউনিটি সদস্য অংশগ্রহণ করেন, তাদের মধ্যে অনেক মিল খুঁজে পাওয়া যাবে; কিন্তু শ্রেণিগত বিচারে তা নাও পাওয়া যেতে পারে।

বাংলাদেশে বিভিন্ন গবেষণায়ও কমিউনিটির কার্যকর অংশগ্রহণ নিয়ে সাম্প্রতিক সময়ে বেশ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ হচ্ছে। এসব গবেষণায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সাথে কমিউনিটি কীভাবে সম্পৃক্ত, এই সম্পৃক্ততার মাত্রা কোন পর্যায়ের এবং এ-ধরনের সম্পৃক্ততায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা কীভাবে উপকৃত হচ্ছে এসব বিষয় আলোচিত হচ্ছে। উল্লেখ্য, গবেষণাগুলোতে সাধারণভাবে কমিউনিটি বলতে শিক্ষার্থীদের পিতামাতা বা অভিভাবক, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান যেখানে অবস্থিত সেখানকার স্থানীয় বাসিন্দা বা গণ্যমান্য ব্যক্তি, শিক্ষানুরাগী ব্যক্তি, সম্পদশালী এবং স্থানীয় বা জাতীয় পর্যায়ে 'ক্ষমতায়ন'-এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সম্মিলিত অংশগ্রহণকে বুঝানো হয়ে থাকে।

কমিউনিটি অংশগ্রহণের সংজ্ঞা ও ব্যাপ্তি

বর্তমান লেখার ভূমিকাতেই বলা হয়েছে যে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হচ্ছে একটি আনুষ্ঠানিক ক্ষেত্র যেখানে শিক্ষার্থীরা লেখাপড়ার সাথে সম্পর্কিত কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত থাকে। এই কর্মকাণ্ড একটি বিজ্ঞানভিত্তিক প্রক্রিয়া যেখানে ধারাবাহিকতা যেমন বজায় রাখতে হয়, তেমনি শিশুদের মনস্তত্ত্ব বিচার করে তাদের উপযোগী পঠন-পাঠন প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হয়। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি অর্থাৎ শিক্ষকরাই এসব কাজে পারদর্শী এবং তাঁরা জানেন কীভাবে শিক্ষাদানের প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি অনুসরণ করে শিক্ষার্থীদের গড়ে তুলতে হয়। প্রশ্ন হচ্ছে– শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মূল কর্মকাণ্ড যদি শিক্ষকরাই পরিচালনা করেন, তাহলে সেখানে কমিউনিটির অংশগ্রহণ বলতে আসলে কী বুঝানো হয়? এই অংশগ্রহণই বা কেন? এর কি আদৌ কোনো প্রয়োজনীয়তা রয়েছে? থাকলে এর ব্যাপ্তি কতোটুকু?

উপর্যুক্ত সবগুলো প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে নিচের ছকটি থেকে। বিভিন্ন দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে কমিউনিটির অংশগ্রহণের বৈশিষ্ট্য ও পরিসর বিবেচনা করে Uemura (1999) দেখিয়েছেন কীভাবে কমিউনিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমে অংশ নিতে পারে।

ছক ১: শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কমিউনিটির অংশগ্রহণের ব্যাপ্তি	
• বিদ্যালয়ে ভর্তি ও শিক্ষার উপকারিতা সম্পর্কে প্রচারণা চালানো	• বিদ্যালয় যথাযথ পরিচালনার জন্য গ্রাম শিক্ষা কমিটি গঠন
• বিদ্যালয়ের শিক্ষক-কর্মকর্তাসহ সবার মনোবল বাড়ানো	• দক্ষতা নির্দেশনা ও স্থানীয় সংস্কৃতি সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ করা
• বিদ্যালয়ের জন্য অর্থের সংস্থান করা	• শিক্ষার্থীদের পড়ালেখায় সহায়তা করা
• শিক্ষার্থীদের নিয়মিত উপস্থিতি ও ঠিকমতো পড়ালেখা সম্পন্ন করার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া	• পর্যাপ্ত সম্পদ সঞ্চয় করা ও আমলাতন্ত্রের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করা
• বিদ্যালয়ের সুযোগ-সুবিধা উন্নত করা, মেরামত করা ও নতুনভাবে তৈরি করা	• নারী শিক্ষার প্রচারণা চালানো ও এর হার বাড়ানো
• শ্রম, উপকরণ, জমি ও অর্থের যোগানে সহায়তা দেওয়া	• শিক্ষকদের জন্য বাসস্থানের ব্যবস্থা করে তাঁদের জন্য নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা
• নতুন শিক্ষক নিয়োগ ও তাঁদের সহায়তা করা	• বিদ্যালয় কার্যক্রমের সময়সূচি নির্ধারণ করা
• বিদ্যালয়ের অবস্থান ও সময়সূচি সম্পর্কে সিদ্ধান্তগ্রহণ করা	• বিদ্যালয় পরিচালনার জন্য বাজেট সংকুলান করা
• শিক্ষকদের উপস্থিতি ও কর্মকাণ্ড নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা	• শিক্ষাবিষয়ক সমস্যার পেছনের কারণসমূহ চিহ্নিত করা (নিম্ন ভর্তির হার, একই শ্রেণিতে পুনরাবৃত্তির উচ্চহার এবং ঝরে পড়া) এবং
• শিক্ষার্থীদের শিখন অগ্রগতি ও শ্রেণিকক্ষ-আচরণ সম্পর্কে জানার জন্য বিদ্যালয়ের সভায় নিয়মিত উপস্থিত থাকা	• শিক্ষার্থীদের জ্ঞানমূলক দক্ষতা বিকাশের লক্ষ্যে তাদের পর্যাপ্ত পুষ্টি ও উদ্দীপনা প্রদানের মাধ্যমে বিদ্যালয়-ব্যবস্থার জন্য প্রস্তুত করা।

শিক্ষায় কমিউনিটি অংশগ্রহণ

এই ছক থেকে যা দেখা যাচ্ছে, তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হলো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ডে কমিউনিটির অংশগ্রহণ শুধু প্রতিষ্ঠানের সীমানাতেই আবদ্ধ থাকছে না; বরং প্রতিষ্ঠানের বাইরেও শিক্ষার্থীদের বাড়ি, গ্রাম এমনকি স্থানীয় পর্যায়ে বিভিন্ন ইভেন্টেও তা প্রসারিত। অন্যদিকে, কমিউনিটির অংশগ্রহণকে এখানে সর্বক্ষেত্রেই সক্রিয় বলে বিবেচনা করা হয়েছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষকদের পাঠদানের বাইরেও বেশ কিছু দায়িত্ব রয়েছে। সেগুলোতেও কমিউনিটির অংশগ্রহণের সুযোগ রয়েছে। মোটামুটিভাবে বিদ্যালয়ের যাবতীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সঙ্গে কমিউনিটির অংশগ্রহণকে এখানে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

অপরদিকে Shaeffer (1994) কমিউনিটির নির্দিষ্ট কিছু কাজ চিহ্নিত করেছেন যা নিম্নরূপ:

- কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে আলোচনার মাধমে সক্রিয় অংশগ্রহণ;
- অর্থ, উপকরণ কিংবা শ্রম সহায়তার মাধ্যমে অংশগ্রহণ;
- অন্যদের সদস্যদের সহযোগী হিসেবে সেবা প্রদানের নিমিত্তে অংশগ্রহণ;

- স্ব স্ব ক্ষমতা অনুসারে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন, বিভিন্ন সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় সরাসরি অংশগ্রহণ, সমস্যা চিহ্নিত করা, সমাধানের পরিকল্পনা করা এবং তা মূল্যায়ন করা;
- শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ডে উপস্থিত হওয়ার মাধ্যমে (উদাহরণ: বিদ্যালয়ের সভায় অংশগ্রহণ) এবং সরাসরি না থাকতে পারলে অন্যদের সিদ্ধান্তগ্রহণ করার মাধ্যমে পরোক্ষভাবে ও পরবর্তী সময়ে তা বাস্তবায়নে পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ।

অর্থাৎ দুটো ক্ষেত্রেই কমিউনিটির অংশগ্রহণের যে সংজ্ঞা ও পরিসর দেখা যাচ্ছে, তাতে দেখা যায়, শিক্ষার্থীদের পাঠদান-সম্পর্কিত কর্মকাণ্ডে কমিউনিটির খুব বেশি বা সরাসরি অংশগ্রহণের সুযোগ না থাকলেও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অন্য যেসব উন্নয়নের ক্ষেত্র রয়েছে, সেগুলোতে কমিউনিটি সরাসরি অংশগ্রহণ করতে পারে। এই অংশগ্রহণ যে সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সমভাবে হয় বা হচ্ছে তা নয়; কিন্তু উক্ত দুটো মডেল থেকে এটুকু অনুধাবন করা যায়, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের উন্নতিকল্পে কমিউনিটির অংশগ্রহণের ব্যাপ্তি কম বিস্তৃত নয়।

বাংলাদেশে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কমিউনিটির অংশগ্রহণ

বাংলাদেশের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষাদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোতে কমিউনিটির এক ধরনের অংশগ্রহণ দেখা যায়। উভয় স্তরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি রয়েছে। বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি কী কী কাজ করবে তাও মোটামুটি নির্ধারণ করা আছে। এর বাইরে বিদ্যালয় বিভিন্ন সময়ে অভিভাবক বা পিতামাতাকে বিদ্যালয়ের সভায় আহ্বান করে থাকে। সার্বিক অর্থে তাই বাংলাদেশের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের বিদ্যালয়গুলোতে কমিউনিটির অংশগ্রহণ দেখা যায়; কিন্তু এই অংশগ্রহণ কতোটুকু কার্যকর তা প্রশ্নসাপেক্ষ।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ডে বিশ্বব্যাপী কমিউনিটির অংশগ্রহণের ধারণা ও চর্চা শুরু হয় আশির দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে যা প্রতিষ্ঠানের সিদ্ধান্তগ্রহণ ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে একটি অতিরিক্ত ব্যবস্থা হিসেবে যুক্ত হতে থাকে। Gustavsson (1990) আশির দশকের শেষদিকে বাংলাদেশের সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নের ওপর একটি গবেষণা করেন। গবেষণার ফলাফল থেকে দেখা যায়, সে সময়ে বাংলাদেশে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অন্যতম সীমাবদ্ধতা ছিল কমিউনিটির স্বল্প অংশগ্রহণ। পরবর্তী সময় থেকে এই অংশগ্রহণের মাত্রা বাড়তে থাকে। বিশেষ করে ২০০০ সালে ডাকার সম্মেলনে এ বিষয়ে গুরুত্বারোপ করার পর থেকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিদ্যালয়-কর্মকাণ্ডে কমিউনিটির অংশগ্রহণ বাড়তে থাকে, যা বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। বিভিন্ন গবেষণা থেকেও দেখা যাচ্ছে, তত্ত্ব হোক, গবেষণা হোক, নীতি কিংবা চর্চা যাই হোক না কেন, সবক্ষেত্রেই এখন বিদ্যালয়-ব্যবস্থার উন্নতির কাজে অভিভাবক ও কমিউনিটি ওতোপ্রোতোভাবে সংযুক্ত থাকে।

এখানে কমিউনিটির অংশগ্রহণের কার্যকারিতার বিষয়টুকু কয়েকটি ধাপে ভাগ করে আলোচনা করা প্রয়োজন। উপরে Uemura (1999) ও Shaeffer (1994)-এর যে পয়েন্টগুলো দেখানো হয়েছে, সেখান থেকে কমিউনিটির অংশগ্রহণকে নিম্নোক্তভাবে উপস্থাপন করা যায়:

- শিক্ষার ব্যাপ্তি ও মান বাড়াতে প্রচারণা চালানো ও সহায়তা করা;
- শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সমস্যা চিহ্নিত ও তার সমাধান করা;
- শিক্ষা-কর্মকাণ্ডে অবলোকনের (monitoring) মাধ্যমে গুণগত মান নিশ্চিত করা;
- শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অন্যান্য কার্যক্রম তদারকি করা।

শিক্ষার ব্যাপ্তি ও মান বাড়াতে প্রচারণা চালানো ও সহায়তা করা

বাংলাদেশে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা হিসেবে কমিউনিটির অংশগ্রহণের সীমাবদ্ধতাকে দায়ী করেছিলেন Gustavsson (1990)। অপরদিকে Harriss (2001) কমিউনিটির কার্যকর অংশগ্রহণকে সামাজিক পুঁজি বা social capital হিসেবে উল্লেখ করেছেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, কমিউনিটি যদি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে, তাহলে শিক্ষার নানা প্রক্রিয়ায় ইতিবাচক ফল আনা সম্ভব। বিশেষ করে শিক্ষার্থীর ভর্তির হার বাড়ানো, ঝরে পড়া রোধ কিংবা নিয়মিত বিদ্যালয়ে উপস্থিত হওয়া ইত্যাদি ক্ষেত্রে কমিউনিটির সদস্যরা সচেতন থাকলে তা শিক্ষায় প্রবেশগম্যতা বাড়ানো ও কার্যকর শিক্ষা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে খুবই সহায়ক ভূমিকা পালন করতে সক্ষম।

শিক্ষার ব্যাপ্তি ও মান বাড়ানোর ক্ষেত্রে কমিউনিটির কাজকে মূলত চার ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমত, তাদের শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ে যা শেখে সেগুলো যেন বাড়িতে যথাযথ চর্চা করতে পারে এবং পরবর্তী সময়ে বিদ্যালয়ে গিয়ে সেগুলোকে আরও পোক্ত করতে পারে, সেরকম পরিবেশ সৃষ্টিতে উদ্যোগী হওয়া। দ্বিতীয়ত, সচেতন অভিভাবকরা যেভাবে নিজেদের সন্তানদের পড়ালেখার কাজে সহায়তা করেন, তাঁরা একইভাবে অন্য অভিভাবকরা যেন তাদের সন্তানদের লেখাপড়ার কাজে সহায়তা করে, সে ধরনের কাজে স্বেচ্ছাসেবী মনোভাব নিয়ে কাজ করতে পারেন। তৃতীয়ত, যেসব অভিভাবক বিদ্যালয় কর্মকাণ্ডের সাথে যুক্ত, তারা বিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় সরাসরি ভূমিকা রাখতে পারেন; বিশেষত যেসব অভিভাবক এই কাজের সঙ্গে যুক্ত নন, তাঁদের পক্ষ থেকে প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে পারেন এবং চতুর্থত, কমিউনিটির অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে বিদ্যালয় ও পিতামাতাদের একটি যোগসূত্র স্থাপন করার কাজে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারেন।

কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে এই কাজ চারটির সবগুলো দৃশ্যমান নয়, হয়তো আমাদের দেশের বাস্তবতায় সবগুলো বাস্তবায়ন করা সম্ভবও নয়। যেসব অভিভাবকের সন্তান বিদ্যালয়ে পড়ছে, তাদের একটি বড় অংশ বাড়িতে সন্তানকে পড়ালেখার কাজে সহায়তা করতে পারে না। আর্থিক কারণে তারা বাড়িতে পড়ালেখার পরিবেশও সৃষ্টি করতে অনেক ক্ষেত্রে অসমর্থ। আর যারা নিজেদের সন্তানকেই এই সহায়তাটুকু করতে পারছে না; স্বাভাবিকভাবে তারা অন্যদের ক্ষেত্রেও এ-বিষয়ে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারবে না। তৃতীয় পয়েন্টটিতে অভিভাবক বা কমিউনিটির যারা বিদ্যালয়-কার্যক্রমে অংশ নিচ্ছেন, তারা কতোটুকু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারছেন তা প্রশ্নসাপেক্ষ। কারণ আমাদের বিদ্যালয়ের অধিকাংশ সিদ্ধান্তই কেন্দ্র থেকে আসে। এসব ক্ষেত্রে ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও ভূমিকা রাখা সম্ভব হয়ে ওঠে না। চতুর্থ পয়েন্টের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। বিদ্যালয়ের কর্মকাণ্ডে অধিকাংশ মানুষের অবদান রাখার ক্ষমতা সীমিত; কেবল বিদ্যালয় আহ্বান করলে তারা বিদ্যালয়ের সভায় বা অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারেন। সব মিলিয়ে দেখা যায়, কমিউনিটির সদস্যরা বিদ্যালয় কাজে উৎসাহী থাকলেও সীমিত বাস্তবতায় তা সম্ভবপর হয়ে ওঠে না। তাছাড়া শিক্ষার ব্যাপ্তির জন্য যেটুকু প্রচারণা চালানোর প্রয়োজন, সেটুকুতে শিক্ষকরা পরিকল্পিতভাবে কমিউনিটির ব্যক্তিদের নিয়ে কাজটি করেন না বা এ-ধরনের নির্দেশনা তাদের কাছে নেই। ফলে এ জায়গাটিতে একটি বড় ঘাটতি রয়েছে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায়।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও তার সমাধান করা: কমিউনিটির একটি বড় দায়িত্ব হচ্ছে বিদ্যালয়ের সমস্যার সমাধান করা। প্রতিটি বিদ্যালয়েরই নানা ধরনের সমস্যা থাকে। সমস্যাগুলোকে মোটাদাগে বেশ কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। কিছু কিছু সমস্যা কমিউনিটি নিজ উদ্যোগেই সমাধান

করতে পারলেও অধিকাংশ সমস্যার ক্ষেত্রে কমিউনিটির কিছু করার থাকে না। এসব ক্ষেত্রে স্থানীয় কিংবা কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থার মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হয়।

একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কী কী সমস্যা থাকতে পারে, তা চিহ্নিত করা খুব একটি কঠিন কাজ নয়। সাধারণ শিক্ষকদের সহায়তায় বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যরা এই কাজটি করে থাকে। কিন্তু এক্ষেত্রে কমিউনিটির অন্য সদস্যদের সহায়তা নেওয়ার কৌশল বিদ্যালয়গুলোতে অনুপস্থিত। এ প্রসঙ্গে এটিও বলা প্রয়োজন যে, যারা বিদ্যালয় কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সরাসরি জড়িত, তারা ছাড়া কমিউনিটির অন্য ব্যক্তিরা কতোটুকু সমস্যা চিহ্নিত করতে পারবেন তা নিয়েও প্রশ্ন তোলা যায়। শুধু অংশগ্রহণের নিমিত্তে অংশগ্রহণ নয়, অংশগ্রহণ যদি কার্যকর না হয়, তাহলে তা কেবল নিয়মরক্ষার আনুষ্ঠানিকতাই পালিত হয়। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সমস্যা চিহ্নিত করে তা সমাধান করার পদ্ধতি মোটাদাগে বাংলাদেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে অনুপস্থিত। যেটুকু দেখা যায়, সেগুলো মূলত ভৌত অবকাঠামোর সাথে সম্পর্কিত; পাঠদান-প্রক্রিয়া কিংবা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পর্কিত নয়।

শিক্ষা-কর্মকাণ্ডে অবলোকনের মাধ্যমে গুণগত মান নিশ্চিতকরণ: যেকোনো কমিউনিটির মধ্যে অনেক স্তর থাকে, বিভিন্ন স্তর থেকে শিক্ষাবিষয়ক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ সমভাবে থাকে না। কিন্তু একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কাজগুলোকে নানা স্তর বা বিভাগে ভাগ করে কমিউনিটির সদস্যদের দ্বারা অবলোকন করানো সম্ভব। সাধারণত কমিউনিটির সদস্যরা আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যক্রম অবলোকন করেন না। এমনকি বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির কিছু দায়িত্ব রয়েছে এ বিষয়ে, সেগুলোও যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হতে দেখা যায় না। কমিউনিটির সদস্যরা যে শিক্ষার নানা বিষয় অবলোকন করতে পারেন এবং তার মাধ্যমে যে শিক্ষার মান বাড়ানো সম্ভব, সেই ধারণাটি এখনও প্রতিষ্ঠিত হয়নি। কমিউনিটির সদস্যরা প্রতিদিন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে গিয়ে বিদ্যালয়ের যাবতীয় কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণ করবেন এটা আশা করা যায় না। কিন্তু কমিউনিটির পক্ষ থেকে দায়িত্ব নিয়ে কিছু সদস্য যদি নিয়মিত বিদ্যালয়ের নানা ধরনের ডকুমেন্ট পর্যালোচনা করেন এবং পাঠদান-প্রক্রিয়ায় শিক্ষকদের অংশগ্রহণের মাত্রা যাচাই করেন, তাহলে শিক্ষার গুণগত মান বাড়ার সম্ভাবনা বাড়ে। সমাজের কাছে শিক্ষকদের এবং প্রতিষ্ঠানের জবাবদিহিতার একটি ক্ষেত্র তৈরি হয়। Mannathoko and Mangope (2013) মনে করেন, শিক্ষকদের পক্ষ থেকে পিতামাতা ও কমিউনিটির সাথে একটি সুসম্পর্ক গড়ে তোলা শিক্ষকদের অন্যতম কাজ। শিক্ষকরা যদি এই কাজটুকু যথাযথভাবে করতে পারেন, তাহলে পিতামাতা ও কমিউনিটি অনেক সময় নিজ দায়িত্বেই পরোক্ষভাবে অবলোকনের কাজগুলো করে দেয়।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অন্যান্য কার্যক্রম তদারককরণ: কমিউনিটির মানুষ বিদ্যালয় কর্মকণ্ডে দুভাগে অংশগ্রহণ করে। এক অংশ সক্রিয়ভাবে বিদ্যালয়ের নানা কর্মকাণ্ডে সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় সরাসরি অংশ নেন। অপরদিকে অন্য অংশটি নিষ্ক্রিয়ভাবে কেবল বিদ্যালয়ের বিভিন্ন ইভেন্টে যোগদান করে থাকেন। উদাহরণস্বরূপ, স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য যদি বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য হন, তাহলে তিনি সরাসরি বিদ্যালয়-কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতে পারেন; কিন্তু অধিকাংশ অভিভাবক, বিশেষত মায়েদের এরকম সুযোগ নেই। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ বছরে একবার বা দুবার মা-সমাবেশের আয়োজন করেন এবং সেখানে মায়েদের অংশগ্রহণ কেবল একজন শ্রোতার।

প্রশ্ন হচ্ছে, কমিউনিটির সব সদস্যকেই কি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কাজে অংশগ্রহণ করতে হবে? এ নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কার্যক্রম তদারককরণে কমিউনিটি সদস্যদের অংশগ্রহণ গুরুত্বপূর্ণ এবং

প্রয়োজনীয়, কিন্তু পরিপ্রেক্ষিতও এক্ষেত্রে একটি বড় উপাদান হিসেবে কাজ করে। আমরা সাধারণত যেসব সফলতার চিত্র জানতে পারি বিভিন্ন গবেষণা থেকে, তার একটি বড় অংশ পরিচালিত হয় উন্নত দেশসমূহে যেখানকার পরিপ্রেক্ষিতের সাথে আমাদের প্রেক্ষাপট মিলবে না। তবে এটাও বলা যায়, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমগুলোর একটি তালিকা তৈরি করে যতোদূর সম্ভব এর তদারকি ও অংশগ্রহণে কমিউনিটিকে যুক্ত করতে পারলে তা প্রকৃতপক্ষে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জন্য সহায়ক হিসেবেই কাজ করার কথা।

উপসংহার

Mannathoko and Major (2012) উল্লেখ করেছেন যে, শিশুদের যথাযথ উন্নতিতে সহায়তার লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের বাধাবিপত্তি দূর করার জন্য বিদ্যালয় ও কমিউনিটির মধ্যকার সেতুবন্ধনের প্রয়োজন রয়েছে।

যেহেতু প্রাচীনকালে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ছিল না, বরং মানুষের যাবতীয় কার্যক্রম আবর্তিত হতো নিজ নিজ সমাজকে কেন্দ্র করে। সুতরাং একসময় শিক্ষাব্যবস্থারও সূচনা ও বিকাশ ঘটে কমিউনিটির মাধ্যমেই। এই প্রক্রিয়ায় কোথাও কোথাও কমিউনিটি সরাসরি অংশগ্রহণ করেছে, কোথাওবা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান বা নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে আলাদাভাবে দায়িত্ব দিয়ে শিক্ষাকার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। সমাজের কাছ থেকে শিক্ষা এক সময় রাষ্ট্রের কাছে হস্তান্তরিত হতে থাকে এবং এক পর্যায়ে রাষ্ট্রই শিক্ষার মূল ব্যবস্থাপক হিসেবে আবর্তিত হয়। কালক্রমে শিক্ষার বিস্তার ও প্রসারের জন্য রাষ্ট্র কমিউনিটির গুরুত্ব উপলব্ধি করে সমাজের মানুষকে পুনরায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে যুক্ত করতে আগ্রহী হয় এবং শিগগিরই এর ইতিবাচক ফল দৃশ্যমান হয়। সুতরাং কমিউনিটির অংশগ্রহণ শুধু কাগজে-কলমে সীমাবদ্ধ না রেখে একে যতোদূর সম্ভব কার্যকর করা যায়, আমাদের বাস্তবতা বা প্রেক্ষাপটের কথা মাথায় রেখে সে-ধরনের কৌশল প্রণয়ন জরুরি।

তথ্যসূত্র

১. Gustavsson, S. (1990). Primary Education in Bangladesh, For Whom? Dhaka: Dhaka University Press.

২. Harriss, J. (2001). Depoliticizing Development. The World Bank and Social Capital. New Delhi: Leftworld Books.

৩. Mannathoko, M. C., & Major, T. E. (2012). Family School Relationships in the teaching of Art and Craft in Primary Schools: A Case Study of Four Primary Schools in the South Central and Central North Regions of Primary. National Teacher Education Journal, 5(1), 63-67.

৪. Mannathoko, M. C., & Mangope, B. (2013). Barriers to Parental Involvement in Primary Schools: Acase of Central North Region of Botswana. International Journal of Scientific Research in Education, 6(1), 47-55. Retrieved 22 June 2015 from http://www.ijsre.com

৫. Niranjanaradhya, V. P. (2014). Community Participation and Institutional Experiences in School Education: School Development and Monitoring Committees in Karnataka. New Delhi: Oxfam India.

৬. Shaeffer, S. (Ed.). (1994). Partnerships and Participation in Basic Education: A Series of

Training Modules and Case Study Abstracts for Educational Planners and Mangers. Paris: UNESCO, International Institute for Educational Planning.

৭. Uemura, M. (1999). Community Participation in Education: What do we Know?.WorldBank.org Site Resources, Retrieved 17 May 2015 from http://siteresources.worldbank.org/INTISPMA/ Resources/383704-1153333441931/14064_Community_Participation_in_Education.pdf